২৮

স্থান -- বেলুড় মঠ
কাল -- (ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

স্বামীজীর শরীর সম্প্রতি অনেকটা সুস্থ; মঠের নূতন জমিতে যে প্রাচীন বাড়িটি ছিল, তাহার ঘরগুলি মেরামত করিয়া বাসোপযোগী করা হইতেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র জমিটি মাটি ফেলিয়া ইতঃপূর্বেই সমতল করা হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী আর অপারাহ্নে শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া মঠের জমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। স্বামীজীর হস্তে একটি দীর্ঘ যষ্টি, গায়ে গেরুয়া রঙের ফ্লানেলের আলখাল্লা, মস্তক অনাবৃত। শিষ্যের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে দক্ষিণমুখে ফটক পর্যন্ত গিয়া উত্তরাস্যে ফিরিতেছেন -- এইরূপে বাড়ি হইতে ফটক ও ফটক হইতে বাড়ি পর্যন্ত বারংবার পদচারণা করিতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে বিল্বতরুমূল বাঁধানো হইতেছে; ঐ বেলগাছের অদূরে দাঁড়াইয়া স্বামীজী এইবার ধীরে ধীরে গান ধরিলেন:

গিরি, গণেশ আমার শুভাকারী।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরির আগমন,
ঘরে আনব চন্ডী, শুনব কত চন্ডী,
আসবে কত দন্ডী যোগী জটাধারী!

-- গান গাহিতে গাহিতে শিষ্যকে বলিলেন: 'হেথা আসবে কত দন্ডী যোগী জটাধারী'! বুঝলি? কালে এখানে কত সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হবে! -- বলিতে বলিতে বিল্বতরুমূলে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, বিল্বতরুমূল বড়ই পবিত্র স্থান; এখানে বসে ধ্যানধারণা করলে শীঘ্র উদ্দীপনা হয় -- ঠাকুর এ-কথা বলতেন।

শিষ্য -- মহাশয়, যাহারা আত্মানাত্মবিচারে রত, তাহাদের স্থানাস্থান, কালাকাল, শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচারের আবশ্যকতা আছে কি?

স্বামীজী -- যাঁদের আত্মজ্ঞানে 'নিষ্ঠা' হয়েছে, তাদের ঐ-সব বিচার করবার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু ঐ নিষ্ঠা কি অমনি হলেই হল? কত সাধ্যসাধনা করতে হয়, তবে হয়! তাই প্রথম প্রথম এক-আধটা বাহ্য অবলম্বন নিয়ে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়। পরে যখন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তখন কোন অবলম্বনের আর দরকার থাকে না।

শাস্ত্রে যে নানা প্রকার সাধনমার্গ নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-সব কেবল ঐ আত্ম জ্ঞান-লাভের জন্য। তবে অধিকারিভেদে সাধনা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ঐ-সব সাধনাদিও এক প্রকার কর্ম এবং যতক্ষণ কর্ম, ততক্ষণ আত্মার দেকা নেই। আত্ম-প্রকাশের অন্তরায়গুলি শাস্ত্রোক্ত সাধনরূপ কর্ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, কর্মের নিজের সাক্ষাৎ আত্মপ্রকাশের শক্তি নেই, কতকগুলি আবরণকে দূর করে দেয় মাত্র। তারপর আত্মা আপন প্রভায় আপনি উদ্ভাসিত হয়। বুঝলি? এইজন্য তোর ভাষ্যকার বলছেন, 'ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র সম্বন্ধ নেই।'

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, কোন না কোনরূপ কর্ম না করিলে যখন আত্মপ্রকাশের অন্তরায়গুলির নিরাশ হয় না, তখন পরোক্ষভাবে কর্মই তো জ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

স্বামীজী -- কার্যকারণ-পরম্পরা-দৃষ্টিতে আপাততঃ ঐরূপ প্রতীয়মান বটে। মীমাংসা-শাস্ত্রে ঐরূপ দৃষ্টি

অবলম্বন করেই 'কাম্য কর্ম নিশ্চিত ফল প্রসব করে' -- এ-কথা বলা হয়েছে। নির্বিশেষ আত্মার দর্শন কিন্তু কর্মের দ্বারা হবার নয়। কারণ আত্মজ্ঞানপিপাসুর পক্ষে বিধান এই যে, সাধনাদি কর্ম করবে, অথচ তার ফলাখলে উদাসীন থাকবে। তবেই হল -- ঐ-সব সাধনাদি কর্ম সাধকের চিত্তশুদ্ধির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নয়; কারণ ঐ সাধনাদির ফলেই যদি আত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা যেত, তবে আর শাস্ত্রে সাধককে ঐ-সব কর্মের ফল ত্যাগ করতে বলত না। অতএব মীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রসূ কর্মবাদের নিরাকরণকল্পেই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের অবতারণা করা হয়েছে। বুঝলি?

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, কর্মের ফলাফলেরই যদি প্রত্যাশা না রাখিলাম, তবে কষ্টকর কর্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন?

স্বামীজী -- শরীর ধারণ করে সর্বক্ষণ একটা কিছু না করে থাকতে পারা যায় না। জীবকে যখন কর্ম করতেই হচ্ছে, তখন যেভাবে কর্ম করলে আত্মার দর্শন পেয়ে মুক্তিলাভ হয়, সেভাবে কর্ম করতেই নিষ্কাম কর্মযোগে বলা হয়েছে। আর তুই যে বললি 'প্রবৃত্তি হবে কেন?' তার উত্তর হচ্ছে এই যে, যত কিছু কর্ম করা যায় তা সবই প্রবৃত্তিমূলক; কিন্তু কর্ম করে করে যখন কর্ম থেকে কর্মান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরেই কেবল গতি হতে থাকে, তখন লোকের বিচারপ্রবৃত্তি কালে আপনা-আপনি জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করে -- কর্মের অন্ত কোথায়? তখনি সে গীতামুখে ভগবান যা বলছেন, 'গহনা কর্মণো গতিঃ' -- তার মর্ম বুঝতে পারে। অতএব যখন কর্ম করে করে আর শান্তিলাভ হয় না, তখনই সাধক কর্মত্যাগী হয়। কিন্তু দেহধারণ করে কিছু একটা নিয়ে তো থাকতে হবে -- কি নিয়ে থাকবে বল? তাই দু-চারটে সৎকর্ম করে যায়, কিন্তু ঐ কর্মের ফলাফলের প্রত্যাশা রাখে না। কারণ, যখন তারা জেনেছে যে, ঐ কর্মফলেই জন্মমৃত্যুর বহুধা অঙ্কুর নিহিত আছে। সেইজন্যই ব্রহ্মজ্ঞেরা সর্বকর্মত্যাগী -- লোক দেখানো দু-চারটে কর্ম করলেও তাতে তাঁদের কিছুমাত্র আঁট নেই। এঁরাই শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্মযোগী বলে কথিত হয়েছেন।

শিষ্য -- তবে কি মহাশয়, নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞের উদ্দেশ্যহীন কর্ম উন্মত্তের চেষ্টাদির ন্যায়?

স্বামীজী -- তা কেন?ইজের জন্য, আপন শরীর-মনের সুখের জন্য কর্ম না করাই হচ্ছে কর্মফল ত্যাগ করা। ব্রহ্মজ্ঞ নিজ সুখান্বেষণই করেন না, কিন্তু অপরের কল্যাণ বা যথার্থ সুখলাভের জন্য কেন কর্ম করবেন না? তারা ফলাসঙ্গরহিত হয়ে যা-কিছু কর্ম করে যান, তাতে জগতের হিত হয় -- সে-সব কর্ম 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' হয়। ঠাকুর বলতেন, 'তাঁদের পা কখনও বেচালে পড়ে না।' তাঁরা যা যা করেন, তাই অর্থবন্ত হয়ে দাঁড়ায়। উত্তরচরিতে পড়িসনি -- 'ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোহনুধারিত।' -- ঋষিদের বাক্যের অর্থ আছেই আছে, কখনও নিরর্থক বা মিথ্যা হয় না। মন যখন আত্মায় লীন হয়ে বৃত্তিহীন-প্রায় হয়, তখনই [ঠিক ঠিক] 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ' জন্মায় অর্থাৎ সঘসারে বা মৃত্যুর পর স্বর্গাদিতে কোন প্রকার সুখভোগ করবার বাসনা থাকে না -- মনে আর সঙ্কল্প-বিকল্পের তরঙ্গ থাকে না। কিন্তু ব্যুত্থানকালে অর্থাৎ সমাধি বা ঐ বৃত্তিহীন অবস্থা থেকে নেমে মন যখন আবার 'আমি-আমার' রাজ্যে আসে, তখন পূর্বকৃত কর্ম বা অভ্যাস বা প্রারব্ধজনিত সংস্কারবশে দেহাদির কর্ম চলতে থাকে। মন তখন প্রায়ই superconcious (অতিচেতন) অবস্থায় থাকে, না খেলে নয়, তাই খাওয়া-দাওয়া থাকে -- দেহাদি-বুদ্ধি এত অল্প বা ক্ষীণ হয়ে যায়। এই অতিচেতন ভূমিতে পৌঁছে যা যা করা যায়, তাই ঠিক ঠিক করতে পারা যায়; সে-সব কাজে জীবের ও জগতের যথার্থ হীত হয়, কারণ তখন কর্তার মন আর স্বার্থপরতায় বা নিজের লাভ-লোকসান খতিয়ে দূষিত হয় না। ঈশ্বর superconscious state-এ (জ্ঞানাতীত ভূমিতে) সর্বদা অবস্থান করেই এই জগদ্রূপ বিচিত্র সৃষ্টি করেছেন; এ সৃষ্টিতে সেজন্য কোন কিছু imperfect (অসম্পূর্ণ) দেখা যায় না। এইজন্যই বলছিলুম, আত্মজ্ঞের ফলাসঙ্গরহিত কর্মাদি অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয় না -- তাতে জীবের ও জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়।

শিষ্য -- আপনি ইতঃপূর্বে বলিলেন, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরবিরোধী; ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের তিলমাত্র স্থান নাই, অথবা কর্মের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন হয় না, তবে আপনি মহা রজোগুণের উদ্দীপক উপদেশ -- মধ্যে মধ্যে দেন কেন? এই সেদিন আমাকেই বলিতেছিলেন, 'কর্ম কর্ম কর্ম -- ন্যান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।'

স্বামীজী -- আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম, এ দেশের মতো এত অধিক তামস-প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাইরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভেতরে একেবারে ইট-পাটকেলের মতো জড়ত্ব -- এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে? এমন অকর্মা, অলস, শিশ্নোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে? ওদেশ (পাশ্চাত্য) বেড়িয়ে আগে দেখে আয়, পরে আমার ঐ কথার প্রতিবাদ করিস। তাদের জীবনে কত উদ্যম, কত কর্মতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ! তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না, সর্বাঙ্গে paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে! আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই! কি হবে রে, জড়পিন্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়ে-চেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই -- এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' -- এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কাজে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে-গাঁঢে দেশে-দেশে এই অভয়বাণী আচন্ডালব্রাহ্মণকে শোনাগে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা -- তোমরা অমিতবীর্য, অমৃতের অধিকারী। এইভাবে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর -- জীবনসংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর, তারপর মুক্তিলাভের কথা তাদের বল। সগে ভেতরের শক্তি জাগদ্দত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করা, উত্তম অশন-বসন, উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পারবে, তা বলে দে। আলস্য, হীনবুদ্ধিতা, কপটাতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে! বুদ্ধিমান লোক এ দেখে কি স্থির হয়ে থাকতে পারে? কান্না পায় না? মাদ্রাজ, বম্বে, পাঞ্জাব, বাঙলা -- যেদিকে চাই, কোথাও যে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না। তোরা ভাবছিস -- আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুন্ড শিখেছিস? কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভেতরে পুরে পাশ করে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরানিগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি -- এই তো! এতে তোদেরই বা কি হল, আর দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি? -- কখনও নয়। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর -- চাকরি গুখুরি করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে। ঐ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে -- তার তোরা কি করছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজললে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শি৮ইয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্ম-কথায় কেয় কান দেবে না। তাই বলি -- আগে আপনার ভেতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর, তারপর দেশের ইতর-সাধারণ সকলের ভেতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে প্রথম অন্নসংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে তাদের শেখা। আর বসে থাকবার সময় নেই। কখন কার মৃত্যু হবে, তা কে বলতে পারে?

কথাগুলি বলিতে বলিতে ক্ষোভ দুঃখ ও করুণার সহিত অপূর্ব এক তেজের মিলনে স্বামীজীর বদন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চক্ষে যেন অগ্নিফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার তখনকার সেই দিব্যমূর্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে শিষ্যের আর কথা সরিল না! কতক্ষণ পরে স্বামীজী পুনরায় বলিলেন:

ঐরূপ কর্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আসবেই আসবে -- বেশ দেখতে পাচ্ছি; There is no escape (গত্যন্তর নেই); ... ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে; কালে তার উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ মধ্যাহ্ন-সূর্যকরে আলোকিত হবে।